কলম
বর্ষ ৯ । সংখ্যা ১০৭ । মঙ্গলবার । ৫ বৈশাখ, ১৪২৯ । ১৯ এপ্রিল, ২০২২

স্থানীয় সংস্কৃতি

বাঙালির বিভিন্ন সর্বজনীন উৎসবের সময়ে এখানকার মুসলমানরা দ্বিধায় পড়িয়া যান। এইসব উৎসব ও সংস্কৃতিকে কতটা গ্রহণ করিবে, আর কতটা বর্জন করিবে তাহা লইয়া বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এ ব্যাপারে উদার দৃষ্টির পরিচয় দেয়। প্রচলিত প্রথা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিরা ভুল কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে পারে না। দিনশেষে মুসলিম উম্মাহ হইল দীর্ঘদিনের পরম্পরা, হেরিটেজ এইসব কিছুর সমাহার মাত্র। তাই স্থানীয় সংস্কৃতির বিষয়গুলিকে অবশ্যই ইতিবাচকভাবে দেখিতে হইবে। গোষ্ঠীভুক্ত মানসিকতাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে হইবে। কারণ, দলবদ্ধ গোষ্ঠী মানবতার স্বার্থেও কাজ করিতে পারে। চূড়ান্ত বিবেচনায় উম্মাহ হইতেছে এমন একটি গ্রুপ, শুভ ও কল্যাণকর যেকোনও কিছু এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাহারা কাজ করিয়া চলে। সংস্কৃতির মধ্যে যদি নগ্নতা, অন্যায়, অনৈতিক ও মন্দের কোনও উপাদান না থাকে, তবে নিজেকে সেই সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করার মধ্যে দোষের কিছু নাই।

মনে রাখা দরকার, জাতীয় বা স্থানীয় সংস্কৃতি পূর্ববর্তী প্রজন্মের সম্মিলিত অবদান। জীবন, সমাজ ও জাতির জন্য তাহাদের এই অবদান কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না থাকিলে তাহারা নিজেদের সংস্কৃতিকে আগাইয়া লওয়ার জন্য নিরন্তর কাজ করিত না। বিশ্ব সংস্কৃতি এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সহিত ইসলামের সম্পর্ক বিরোধপূর্ণ নহে। মুসলমানরা মানুষকে বর্ণবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে দেখে না। যাহা কিছু মানুষের জন্য শুভ ও কল্যাণকর, তাহাকে তুলিয়া ধরিতে ইসলাম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাহা কিছু সমাজের জন্য ক্ষতিকর, ইসলাম তাহাকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে চাহে।

ইসলাম-পূর্ব আরব সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্য রীতি, আচার ও ব্যবহার লইয়াই ছিল মহানবী সা.-এর জীবনাচার। বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক আচার ও প্রথা গ্রহণের নীতি এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। যেমন— নবী সা. প্রবর্তিত পোশাকের বিধানের উদ্দেশ্য অনারব মুসলমানদের সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ করা নহে। ইসলামের মূলনীতির বিস্তৃত আওতার মাঝেই তাহারা নিজ অঞ্চলের প্রচলিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করার ব্যাপারে স্বাধীন। তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগের আরব দেশের স্থানীয় সংস্কৃতিকে একেবারে ধ্বংস করেন নাই। তিনি বরং এসবের মাঝে সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছেন। যাহা অসঙ্গত, তাহা সংশোধন করিয়াছেন। যাহা ক্ষতিকর, তাহা পরিবর্তন করিয়াছেন। রাসূল সা. কর্তৃক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে অনুমোদনের সর্বোত্তম উদাহরণ হইল; প্রচলিত সাতটি বাচনভঙ্গিতে কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি দানের সিদ্ধান্ত। কুরাইশরা মক্কার যে বাচনভঙ্গি অনুসরণ করিত, আরবের সব গোত্রই তাহা বুঝিত। ইহা ছিল অন্যান্য আরব গোত্রের প্রতি নবীজির শ্রদ্ধা, সৌজন্য ও সুবিবেচনার পরিচায়ক। ইহা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহু মত ও পথকে মানিয়া লওয়ার ইঙ্গিত দেয়। আরব গোত্রসমূহ এবং অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি রাসূল সা.-এর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্ববহ একটি উদাহরণ এবং তাহা ইসলামের মৌলিক বুনিয়াদি নীতি। সাংস্কৃতিক নীতি ও চর্চার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যকে রাসূল সা. ব্যাপক অনুমোদন ও সমর্থন দেন। প্রয়োজন ছাড়া তিনি এসব রদবদল করেন নাই। এইভাবে তাঁহার জীবন হইতেই অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

সুস্থ ও কল্যাণকর প্রথা ও রীতিনীতির উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা গ্রহণযোগ্য। তাই স্কলারদের অভিমত হইতেছে, জনগণকে তাহাদের প্রথা ও রীতিনীতি এবং আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করিতে দিতে হইবে। প্রথার ব্যাপারে ইসলাম খোলামেলা ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। কঠোরতার পরিবর্তে নমনীয়তার পক্ষে অবস্থান লওয়াই হইল ইসলামের মূলনীতি। ইসলামের উৎসবগুলি আরবে যেভাবে পালিত হয়, এ দেশে ঠিক সেভাবে পালিত হয় না। স্থানভেদে ইহার খাদ্য, পোশাকে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাইবে। এই বৈচিত্র্যকে মানিয়া লইতে হইবে। তাহাই ইসলামের শিক্ষা।

যে দিন ভেসে গেছে

সুব্রত গুপ্ত

কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছি তখন বছর দশেক হবে। কলকাতায় এক নামি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কর্মরত। পার্ক স্ট্রিটে অফিস। আমরা কয়েকজন সহকর্মী প্রায়ই গল্প করতে করতে একসঙ্গে ধর্মতলা পর্যন্ত হেঁটে এসে যে যার গন্তব্যের বাস ধরতাম।

সেদিনও তেমনই গল্প করতে করতে হাঁটছি, নজরে পড়ল উলটো দিক থেকে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে এক যুবক তার মায়ের সঙ্গে রাস্তা পার হচ্ছে। যুবকটিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এ যে অমিত, কলেজে আমার সহপাঠী। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। দু'জনের কেউ একজন একদিন কলেজে না গেলে অন্যজনের মন খারাপ হয়ে যেত। এমনই ছিল আমাদের বন্ধুত্ব। ভাবতাম এমন বন্ধুত্বে কখনও ছেদ পড়বে না।

যদি জানতেম

কিন্তু ছেদ পড়ল। ওদের বাড়ি অসমে। ওরা দুই ভাই ছিল যমজ। অমিত আর সুমিত। দেখতে অবিকল একরকম। কিন্তু পড়ার বিষয় আলাদা হওয়ায় দুই ভাই আলাদা কলেজে পড়ত। তবে সুমিত প্রায়ই আমাদের কলেজে আসত ভাইয়ের কাছে। সেই সূত্রে সুমিতের সঙ্গেও আলাপ ছিল। কিন্তু মুশকিল হত, দুই ভাইয়ের চেহারা একইরকম হওয়ায় চিনতে না পেরে মাঝে মাঝেই ভুল করতাম। ওরাই হাসতে হাসতে বলে দিয়েছিল, দু'জনের হাতের নখ দেখতে আলাদা। তা দেখেই শুধু আলাদা করা যায় ওদের।

কলকাতায় যে বাড়িতে ওরা থাকত, সেখানে ওদের মা এসে তখন থাকতেন ওদের সঙ্গে। আমি ওদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতাম, অমিতও আসত আমাদের বাড়িতে।

যাই হোক, একদিন কলেজের পাট শেষ হল। অমিত আর সুমিত ফিরে গেল অসমে। খুব মন খারাপ হয়ে গেল। তখন ল্যান্ড ফোন খুব কম বাড়িতেই থাকত, মোবাইল ফোনের তো নামগন্ধও ছিল না। তাই যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠি। প্রথম প্রথম বেশ ভালই চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলত। অমিত ঢুকে পড়ল ওদের পারিবারিক ব্যবসায়, আর সুমিত পাড়ি জমালো কানাডায়।

আমি ঢুকে পড়লাম বিজ্ঞাপন জগতে। সারাদিন কাটে ব্যস্ততায়। কালের নিয়মে অমিতের সঙ্গে চিঠি চালাচালিও কমে এল। ও অনেকবার অসমে ওদের বাড়িতে যেতে লিখেছে। কিন্তু বিধি বাম। টানা কয়েকদিন ছুটি পাওয়াই মুশকিল হত। তাই অনেকবার যাব যাব করেও যেতে পারিনি। ওদিকে পারিবারিক ব্যবসা সামলে কলকাতায় আসা সম্ভব হচ্ছিল না অমিতের। এভাবেই ক্রমশ কমতে কমতে একসময়ে বন্ধ হয়ে গেল যোগাযোগ।

এরপর কেটে গেছে কত বছর। আজ হঠাৎ সেই অমিতকে দেখছি ওর মায়ের সঙ্গে চৌরঙ্গী রোড পার হয়ে চলেছে। আমি দৌড়ে অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে অমিতকে ধরতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। দু'পাশ দিয়ে দু'দিকে গাড়ি ছুটছে। আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে। অমিতরা ক্রমে মিলিয়ে গেল গ্র্যান্ডের ফুটপাতে। মনে হল, না থাক, যে সময় পেরিয়ে এসেছি সে সময়টা তো আর ফিরে আসবে না। পুরোনো স্মৃতি আঁকড়ে আর বর্তমানে ফিরতে ইচ্ছে করল না। আমি দশটা বছর পেরিয়ে এসেছি, অমিতও তাই। আমাদের ভালোলাগা-মন্দলাগাও পালটে গেছে। আজ হয়তো শুধু ভদ্রতার খাতিরে দু'জন দু'জনের খবর নেব। তারপর আবার হবে দুস্তর ব্যবধান। তার চেয়ে এই ভালো। সেই অমিতকে তো আর ফিরে পাব না। অমিতও কি মেলাতে পারবে সেই সুব্রতকে! না তা হয় না।

কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন ফিরে গিয়েছিলাম সেই অতীতে। সহকর্মীরা সবাই চলে গেছে যে যার গন্তব্যে। আমিও আমার পথ ধরলাম। এরপর কেছে গেছে কত কাল, কত যুগ। আর কোনোদিন দেখা বা যোগাযোগ হয়নি আমাদের। আজ আমি কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে। জানি না অমিত এখন কোথায় কেমন আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সেদিন যদি ডেকে দেখা করতাম তা হলে ক্ষতি কী ছিল? হয়তো আবার নতুন করে যোগাযোগ হত। তা হলে তো আজ এমন করে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এমন লেখা লিখতে হত না!

বাংলা সনের প্রবর্তক সম্রাট আকবর, না রাজা শশাঙ্ক তা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই মনে করেন সম্রাট আকবরই বঙ্গাব্দের সূচনা করেন। হিজরি সনের চান্দ্র মাস ও সৌরনির্ভর মাসের সমন্বয়ে বর্ষ গণনার এই নতুন পদ্ধতি তিনিই প্রথম প্রচলন করেন। কারণ কৃষি-প্রধান দেশে রাজস্ব আদায়ে তা ছিল অধিক উপযোগী। এ নিয়ে লিখছেন **মুহাম্মদ আবদুল আলিম**

বাংলা সনের প্রবর্তক গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক, না মুঘল সম্রাট আকবর?

দরবার কক্ষে সভাসদদের সঙ্গে আলোচনারত সম্রাট আকবর।

বঙ্গাব্দ, বাংলা সন, বাংলা বর্ষপঞ্জি হল বঙ্গদেশের সৌর পঞ্জিকাভিত্তিক বর্ষপঞ্জি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৌর দিনের গণনা শুরু। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে মোট ৩৬৫ দিন কয়েক ঘণ্টা লাগে। এই সময়টাই সৌর বছর। গ্রেগরীয় সনের মতো বঙ্গাব্দেও মোট ১২টি মাস রয়েছে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। আকাশের রাশিমণ্ডলীতে সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে বঙ্গাব্দের মাসের হিসাব করা হয়। যেমন যে সময় সূর্য মেষ রাশিতে থাকে সে মাসের নাম বৈশাখ।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও পূর্ব ভারতের অসম ও ত্রিপুরায় এবং বাংলাদেশে এই বর্ষপঞ্জি ব্যবহৃত হয়। বঙ্গাব্দ শুরু হয় পয়লা বৈশাখ দিয়ে। বঙ্গাব্দ সব সময়েই গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির অপেক্ষা ৫৯৩ বছর কম। সংশোধিত বাংলা পঞ্জিকা বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় ১৯৮৭ সালে। বাংলা বা বঙ্গাব্দের প্রচলন শুরু হলে বাংলায় শকাব্দ, লক্ষণাব্দ, পালাব্দ, চৈতন্যাব্দ ইত্যাদি সনের প্রচলন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই সন বা অব্দ বাঙালি জাতির একান্ত নিজস্ব অব্দ।

বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনভুক্ত হয় ১৫৭৬ খিস্টাব্দে। ১২০১ খিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা জয়ের পর মুসলমান শাসনামলে তৎকালীন প্রচলিত শকাব্দ ও লক্ষণাব্দ সনের পাশাপাশি শাসনকার্যে ইসলামি হিজরি সনের প্রচলন শুরু হয়। 'সন' শব্দটি আরবি শব্দ হতে উদ্ভূত, যার অর্থ বর্ষ। আর 'সাল' কথাটা এসেছে ফারসি শব্দ হতে।

বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের সূচনা নিয়েও অনেক বিতর্ক ও বিভ্রান্তি রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে বঙ্গাব্দের সূচনা সম্পর্কে চার ধরনের মত চালু আছে।

প্রথম মত অনুযায়ী, প্রাচীন বঙ্গদেশের রাজা শশাঙ্ক (রাজত্বকাল আনুমানিক ৫৯০-৬২৫ খ্রিস্টাব্দ) 'বঙ্গাব্দ' সালের প্রচলন করেছিলেন। আধুনিক বঙ্গ, বিহার এলাকা তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুমান করা হয় যে, জুলীয় বর্ষপঞ্জির বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ ৫৯৪ এবং গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির শনিবার ২০ মার্চ ৫৯৪ বঙ্গাব্দের সূচনা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মত অনুসারে, মুঘল যুগে অর্থাৎ ইসলামি শাসনামলে হিজরি পঞ্জিকা অনুসরণ করে সকল কাজকর্ম পরিচালনা করা হত। হিজরি পঞ্জিকা চান্দ্র মাসের উপর নির্ভরশীল। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের চেয়ে ১১/১২ দিন কম হয়। কারণ সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন, আর চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিন। সে জন্য চান্দ্র বৎসরে ঋতুগুলি ঠিক থাকে না। আর বঙ্গদেশে চাষাবাদ ও এ জাতীয় অনেক কাজ ঋতুনির্ভর। এ জন্য মুঘল সম্রাট আকবরের সময়ে প্রচলিত হিজরি চান্দ্র পঞ্জিকাকে সৌর পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্রাট আকবর ইরান থেকে আগত বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমির ফতুহুল্লাহ শিরাজীকে হিজরি চান্দ্র বর্ষপঞ্জিকে সৌর বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব দেন। আমির ফতুহুল্লাহ শিরাজীর সুপারিশে পারস্যে প্রচলিত ফার্সি বর্ষপঞ্জির অনুকরণে ৯৯২ হিজরি মোতাবেক ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর নতুন বর্ষপঞ্জি 'তারিখ-ই-ইলাহি' বা 'ইলাহি সন' চালু করেন। তবে সম্রাট আকবর উনত্রিশ বছর আগে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছর থেকে এই পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এ জন্য ৯৬৩ হিজরি সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। ৯৬৩ হিজরি সালের মুহররম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ মাস, এ জন্য বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস এবং পয়লা বৈশাখকে নববর্ষ হিসাবে ধরা হয়। গবেষক শামসুজ্জামান খান এবং নীতীশ সেনগুপ্ত মনে করেন বাংলা বর্ষপঞ্জির উৎপত্তি পরিষ্কার নয়। এই উৎপত্তিতে ইসলামি প্রভাব ও বৌদ্ধ বা হিন্দু প্রভাব দুইই থাকতে পারে।

তৃতীয় মত অনুসারে, অনেকে হুসেন শাহী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহকে বঙ্গাব্দ সনের প্রবর্তক মনে করেন। যদিও এই মতের পক্ষে তেমন কোনও জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

চতুর্থ মত অনুসারে, তিব্বতের রাজা স্রং সন (তিনি ৬০০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে রাজা হন এবং মধ্য ভারত ও পূর্ব ভারত জয় করেন) বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন, কারণ ওই সময় বাংলার উত্তরাঞ্চলের অনেকটাই তিব্বত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিব্বতের বিখ্যাত শাসক স্রং সন গাম্পোর পিতা স্রং সন এক সময় পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা জয় করেছিলেন— আর সেই সময় তাঁর ছেলের জন্ম হলে সেই মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতেই তিনি ওই অঞ্চলে 'সন' গণনা চালু করেছিলেন। এই মতটা খুব চমকপ্রদ হলেও এর পিছনে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। খুব কম গবেষকই এই মতকে সমর্থন করেছেন।

আবার অনেক ইতিহাসবিদ ও নৃতাত্ত্বিক অবশ্য এও মনে করেন যে বাঙালিদের মধ্যে কৃষির সূচনা থেকেই বাংলা সনের উদ্ভব। কিন্তু ঠিক কবে বা কখন তা শুরু হয়েছে, তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।

যেসব ইতিহাসবিদ ও নৃতাত্ত্বিক সম্রাট আকবরকে বঙ্গাব্দ সনের প্রবর্তক মনে করেন তাঁদের মধ্যে হলেন— বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক পবিত্র সরকার, কাশীপ্রসাদ জয়, সওয়ালরামপ্রসাদ ভাস্কর, ড. অমর্ত্য সেন প্রমুখ। তাঁরা সম্রাট আকবরকেই বাংলা সনের প্রবর্তক হিসেবে মনে করেন। অমর্ত সেন তাঁর 'দ্য আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান' গ্রন্থের মধ্যে এই কথা স্পষ্ট লিখেছেন। তিনি লিখছেন, ''বাংলা 'সনে'র একটি বিশেষত্ব হল— আকবর সারা ভারতজুড়ে বহু ধর্মে গ্রাহ্য যে ক্যালেন্ডার 'তারিখ-ই-ইলাহি' চালু করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন, সেটার প্রভাব কিন্তু আজও টিকে আছে শুধু এই বঙ্গাব্দেই।''

তিনি আরও লিখেছেন, আকবরের আমলে যখন মুসলিম ক্যালেন্ডার বা হিজরির প্রথম সহস্রাব্দ শেষ হয়ে আসছে— তিনি তাঁর রাজত্বে একটি বহু-সংস্কৃতির ক্যালেন্ডার চালু করার প্রয়োজন অনুভব করেন। এটাই ছিল তারিখ-ই-ইলাহি। 'এই ক্যালেন্ডার হিন্দু সূর্যসিদ্ধান্ত রীতি অনুসরণ করত, আবার মুসলিম হিজরির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যও এতে সংযোজিত হয়েছিল— যেমন হিজরির চান্দ্র ইতিহাস।'

> **বাংলা সনের সূচনা নিয়ে বিতর্কটি তোলা হয়েছে কারণ অনেকে রাজা শশাঙ্ককেই এর প্রবর্তক হিসেবে দেখাতে চান। অথচ শশাঙ্কের শতাব্দের সঙ্গে বাংলা সনের মিলও খুব কম। শুধু তাই নয়, রাজা শশাঙ্ক 'বাঙালি' ছিলেন না এবং তাঁর সময়ে আমরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলি তার জন্মই হয়নি। এছাড়াও ৫৯৪ সালে শশাঙ্ক কীভাবে 'বঙ্গাব্দ' চালু করবেন যখন তিনি রাজাই হননি!**

১৯৫৪ সালে ভারতীয় পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির প্রধান ড. মেঘনাদ সাহা অঙ্ক কষে নিশ্চিত ঘোষণা করেছিলেন যে সম্রাট আকবরই বাংলা সনের প্রবর্তক। পরে ওড়িশার ইতিহাসবিদ কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল ড. মেঘনাদ সাহার মতকে সমর্থন করেন। ইতিহাসবিদ রামপ্রসাদ ভাস্করও মনে করেন, ইসলামি হিজরি থেকে উদ্ভূত হয়েছে বাংলা সাল।

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করতেন। কিন্তু হিজরি সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সঙ্গে মিলত না। কারণ বাংলা ছিল কৃষি-প্রধান অঞ্চল, ফলে খাজনা দেওয়া-সহ নানা কাজে বছরের শুরুটা হিসেব করতে সমস্যা হত। এতে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করা হত। খাজনা যেন সুষ্ঠুভাবে আদায় হয় সে জন্য মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সম্রাট আকবর যা চেয়েছিলেন তা হল, রাজস্ব প্রশাসনের সংকট দূর করা। তাঁর এই প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বাংলা সনের উদ্ভব হয়। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ মতে, রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতুহুল্লাহ শিরাজী সৌর সন এবং আরবি হিজরি সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম আবিষ্কার করেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ বা ৯৬৩ হিজরিতে বাংলা সন গণনা কার্যকর হয় যখন আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি এর প্রণয়ন করেন ৯৯২ হিজরি মোতাবেক ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল 'ফসলি সন', পরে 'বঙ্গাব্দ' বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিতি লাভ করে। এর পর থেকেই চৈত্র মাসের শেষ দিনে (সংক্রান্তি) প্রজাদের কাছ থেকে কৃষি ও রাজস্ব কর বা খাজনা আদায় করা হত। সম্রাট আকবরের সময় থেকেই হালখাতা বা পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন শুরু হয়। তখন প্রত্যেকে বাংলা চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকত। এ জন্য নীতীশ সেনগুপ্ত বলেছেন, বাংলা বর্ষপঞ্জি হুসেন শাহই শুরু করুন আর আকবরই, এটা বাংলার ঐতিহ্যগত বর্ষপঞ্জির ভিত্তিতে বসন্তের ফসল সংগ্রহের পর খাজনা আদায় করার কাজ সহজ করে দিয়েছিল। কারণ ইসলামি হিজরি বর্ষপঞ্জি খাজনা আদায়ের দিন ধার্য করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি করে।

ব্রিটিশদের আগে এ দেশে সবাই হিজরি সনই ব্যবহার করত। ফলে ফসল কাটার সময়ে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত, কারণ আগের বছর যে তারিখে ফসল কাটত, পরের বছর সে তারিখ ১১ দিন এগিয়ে যেত। তাই আকবর এক সৌরসংবত প্রবর্তন করেন। এটিই হচ্ছে বঙ্গাব্দ। সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের বছর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ (হিজরি ৯৬৩) এবং ৯৬৩ বঙ্গাব্দ।

বাংলাদেশের বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক প্রয়াত গবেষক শামসুজ্জামান খান তাঁর বইয়েও বাংলা সনের প্রবর্তন নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি সম্রাট আকবরকে বঙ্গাব্দ সনের প্রবর্তক মনে করেন। শামসুজ্জামান খান লিখেছেন, 'আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায়, সম্রাট এমন একটি ত্রুটিমুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত সৌর সন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্যই আদর্শ হবে। বাংলা সনের মধ্যে তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'একে বাংলা সন বা সাল বলা হয়। এই সন ও সাল হল যথাক্রমে আরবী ও ফারসি শব্দ। এটা নির্দেশ করছে এগুলো মুসলিম রাজা বা সুলতান-কর্তৃক বাংলায় পরিচিত করানো হয়।'

শামসুজ্জামান খান আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'আকবর বহুদিন ধরে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে (দিন গণনার) সমস্যা সহজ করে দেওয়ার জন্য এক নতুন বছর ও মাস গণনাক্রম প্রবর্তন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি হিজরি অব্দ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। আমীর ফতুহুল্লাহ শিরাজীর প্রচেষ্টায় এ অব্দের প্রবর্তন হল।'

ঢাকায় বাংলা একাডেমির ফোকলোর বিভাগের উপপরিচালক ড. আমিনুর রহমান সুলতান বলেছেন, বাঙালি বরাবরই পার্বণ প্রিয় জাতি। কিন্তু সম্রাট আকবরের আগে অর্থাৎ শশাঙ্ক থেকে আকবর পর্যন্ত সময়ে পার্বণের তেমন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

আকবরের পৌত্র সম্রাট শাহজাহান রবিবার দিয়ে শুরু হওয়া সাত দিনের সপ্তাহের প্রচলনের জন্য এই তারিখ-ই-ইলাহি বর্ষপঞ্জির সংস্কার করেন। শকাব্দে (ভারতীয় জাতীয় বর্ষপঞ্জি) থাকা মাসের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তারিখ-ই-ইলাহির মাসের নামকরণ করা হয়। আজ বাংলায় যে বর্ষপঞ্জিটি ব্যবহার করা হয়, সেই বর্ষপঞ্জিটিই তার ভিত্তি স্থাপন করে। শামসুজ্জামান খানের মতে, সম্ভবত মুঘল গভর্নর নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সর্বপ্রথম খাজনা আদায় করার জন্য একটি উৎসবের দিন চালু করেন। আর এটা করার সময়ই তিনি আকবরের বার্ষিক খাজনা আদায়ের নীতি গ্রহণ করেন।

কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, মুঘল সম্রাট আকবর নন, ৭ম শতকের গৌড়ের প্রাচীন হিন্দু রাজা শশাঙ্ক 'বঙ্গাব্দ' প্রবর্তন করেছিলেন। আকবরের সময়ের অনেক শতক আগে নির্মিত দুটি শিব মন্দিরে 'বঙ্গাব্দ' (বাংলা বছর) শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর এটাই নির্দেশ করে, আকবরের সময়ের আরও অনেক আগেও বাংলা বর্ষপঞ্জির অস্তিত্ব ছিল। বাংলা সনের সূচনা নিয়ে বিতর্কটি তোলা হয়েছে কারণ অনেকে রাজা শশাঙ্ককেই এর প্রবর্তক হিসেবে দেখাতে চান। অথচ শশাঙ্কের শতাব্দের সঙ্গে বাংলা সনের মিলও খুব কম। শুধু তাই নয়, রাজা শশাঙ্ক 'বাঙালি' ছিলেন না এবং তাঁর সময়ে আমরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলি তার জন্মই হয়নি। এছাড়াও ৫৯৪ সালে শশাঙ্ক কীভাবে 'বঙ্গাব্দ' চালু করবেন যখন তিনি রাজাই হননি! তিনি বঙ্গের শাসক ছিলেন না। মগধের ব্রাহ্মণ শশাঙ্ক গুপ্ত বাঙালি-বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলা ছিল পুরোপুরি বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিনি বৌদ্ধদের জন্য ফরমান জারি করেছিলেন, পাহাড় থেকে সমুদ্র যেখানে বৌদ্ধ পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করবে। তাঁর নির্দেশে বহু বাঙালি বৌদ্ধকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শশাঙ্ক 'বঙ্গাব্দ' চালু করলেন অথচ তার কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখলেন না কেন? কাজেই তিনি বাংলার জন্য আলাদা অব্দ চালু করেছিলেন বলাটা বেশ বাড়াবাড়ি।

বঙ্গাব্দের সূচনা নিয়ে ইতিহাসে যতই বিতর্ক থাকুক, বঙ্গাব্দ-সহ ভারতীয় সকল অব্দের সূচনা হয়েছিল মূলত বৈদিক ঋষিদের হাত ধরে। আর্যরা যখন বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশ করেছিলেন, তখন এই অঞ্চলের আদিবাসীরা বর্ষগণনা করতেন কিনা তা জানা যায় না। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায় যে আর্য ঋষিরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। সে অধীত জ্ঞান আবার একই সঙ্গে ধর্মীয় নিয়মকানুন সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করতেন। এই সূত্রে আর্য ঋষিরা, খালি চোখে দেখা যায় এমন দূর আকাশের নক্ষত্রাদি, সূর্য, খালি চোখে দেখা যায় এমন গ্রহগুলো, চাঁদ ইত্যাদির গতিপথ এবং পৃথিবীর ঋতুচক্র ইত্যাদি সব মিলিয়ে পঞ্জিকার আবিষ্কার করেছিলেন। প্রাচীনকালের ঋষিদের গবেষণালব্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান বহুভাবে বহুবার পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব পঞ্জিকার সৃষ্টি হয়েছিল তা এই সকল ঋষিদের জ্ঞান অনুসারে। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে সেইসব পঞ্জিকার নাম বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। এইসব ঋষিদের প্রণীত সৌর সালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বোধ হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমির ফতুহুল্লাহ শিরাজী আকবরের আদেশে বঙ্গাব্দ সনের প্রবর্তন করেন।

...অভিমত

একচক্ষু হরিণ হয়েই কি বাঁচব?

মানুষের জীবন থেকে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা। সমস্ত অন্যায়-অনাচার মুখ বুজে সহ্য করতে করতে, দেখেও না দেখার ভান করে আমরা হারিয়ে ফেলছি আমাদের নিজস্ব পরিচয়, ঐতিহ্য। ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে আমাদের গর্ব, আমাদের জাতিসত্ত্বার অহংবোধ। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, আমাদের প্রতিবাদ চেতনা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

সারা দেশজুড়েই মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে— প্রতিবাদ না করে নীরবে গা বাঁচিয়ে চলা। চোখের সামনে অজস্র অন্যায় দেখেও আমরা প্রতিবাদ না করে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলি। এ বড় অশুভ সংকেত। ভয়াবহ বিপর্যয়ের আগাম আভাস। এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। একদিন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে। পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে আপনি যতই নির্বিকার থাকার চেষ্টা করুন না কেন, সে আগুনের শিখা আপনার গৃহটিকেও গ্রাস করবে। তখন নাকে সরষের তেল দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন তো?

তবুও প্রতিবাদ হয়। কারণ সাধারণের মধ্যেই মিশে থাকে কিছু অসাধারণ চরিত্র, ব্যতিক্রমী মানুষ। তাঁরা সাধারণের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কিন্তু বড় দুঃখের কথা, সাধারণ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তবুও ব্যতিক্রমীরা ব্যতিক্রমী। চিরকালই। সমস্ত বিপদ হেলায় তুচ্ছ করে তাঁরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন। তাই এখনও দশজনের সামনে ইভটিজিং হলে ন'জন চোখ বন্ধ করে নিলেও ওই একজন এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাঁরা বরাবরই সংখ্যায় কম। তাই প্রতিবাদ করার 'শাস্তি'স্বরূপ অনেক সময় তাঁদের চড়া মূল্য দিতে হয়। শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে, এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি। সত্যেন্দ্র দুবে থেকে গৌরী লঙ্কেশ— চারিদিকে ছড়িয়ে আছে অজস্র নাম। তাঁদের জন্য একটু হা-হুতাশ আর নীরবে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলার সময় বা সদিচ্ছা কি আমাদের আছে? আছে কি আমাদের সে মন? তবুও প্রতিবাদ বেঁচে থাকে। নিজস্বতায়। স্বকীয় ধর্মে। যুগে যুগে। কালে কালে।

এ ক্ষেত্রে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা অনেক সময়ে আমাদের হতাশ করে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায় যাদের হাতে তারা যদি সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে আমাদের আর কি-ই বা করার থাকে? যে ব্যক্তি নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন, তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক নিরাপত্তা দেওয়ার কাজ কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন-সরকারের। তারা সেক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালনে অনেক সময়ে ব্যর্থ। এমনটি চলতে থাকলে সাধারণের মধ্যে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা দিন দিন কমে আসবে। বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকা প্রতিবাদ চেতনার দীপ একদিন নিভে যাবে। সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা একজন পুরুষ বা নারীর জন্য ভিড়ের মধ্যে থেকে একা এগিয়ে আসার যে প্রবণতা, তার জন্য কোনও উচ্চশিক্ষা বা ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় জ্বলে ওঠার জন্য একটা স্ফুলিঙ্গ। যার বুকের মধ্যে এই স্ফুলিঙ্গ থাকে সে অগ্র-পশ্চাৎ ভাবে না। কিন্তু সেই অসীম সাহসীর কৃতকর্মের ফল যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে সে আর এগিয়ে আসবে কেন?

মনে করুন, আপনার বাড়ির পাশে কেউ শব্দদূষণের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লাগাতার লাউডস্পিকার বাজিয়ে যাচ্ছে। আপনি এক্ষেত্রে প্রতিবাদ করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনি আক্রান্ত হতে পারেন। আপনি যদি পুলিশের সাহায্য নেন, তাহলে পাড়ায় আপনার বসবাস দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে আপনাকে নীরবে সহ্য করতে হবে শব্দদানবের দুরাচার। ধরুন, ন্যায্য ভাড়া দিয়ে আপনি বাসে চেপেছেন সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছবেন বলে। কিন্তু বাস চালকের মর্জি নেই, তাই সে গতি নেবে না। আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন না। কারণ আপনাকে নির্বিকারভাবে বাস থেকে নেমে যেতে বলা হবে, সঙ্গে কটু কথাও জুটতে পারে। আবার ধরুন, আপনি আপনার মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেবেন বলে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মোড়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো ছেলে দূর থেকে অশ্রাব্য কটূক্তি ছুড়ে দিচ্ছে। আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনাকে আরও অপমানজনক কথাবার্তা শুনতে হতে পারে, ভাগ্যে প্রহারও জুটতে পারে। আপনি অসহায়। এইভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়তে থাকে অসহায়তা। একচক্ষু হরিণের মতো যদি বিপদটা না দেখতে পাই তবে বাঁচব কেমন করে?

তবে এ কথা সত্যি, সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে মুখর হতে পারলে অন্যায়কারীরা পালিয়ে যাবে। তাহলে বাঁচব আমি, আপনি। বাঁচবে সুস্থ সমাজ।

মতিউর রহমান, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ